ঔপনিবেশিক কালপর্বে নারী শিক্ষা

ভারতবর্ষের ইতিহাসে স্ত্রী শিক্ষার গতিপ্রকৃতি পর্যবেক্ষণ করলে এক বিপরীতধর্মী চরিত্র নজরে আসে। প্রাচীনকালে বৈদিক যুগে স্ত্রীশিক্ষা চিত্র যতখানি উজ্জল আধুনিককালে শিক্ষার পরিধি ততখানি সংকুচিত হয়ে নারীদের অন্ধকারে ঠেলে দিয়েছে। যদিও প্রাচীন ভারতের সর্বত্র নারীর অগ্রগতি কখনো সমান্তরাল ছিল না ।কোথাও নারী পেয়েছিলেন মর্যাদা আবার কোথাও ছিলেন তারা নির্যাতিতা।তবে বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থ গুলিতে কিছু কিছু ক্ষেত্রে নারীকে স্বতন্ত্র চিন্তার সুযোগ করে দেওয়া হয়েছিল।

মধ্যযুগের ইতিহাসের মুঘল ভারতে নারী শিক্ষার অগ্রগতি নিয়ে যেসব উদাহরণ পাওয়া যায় তা অত্যন্ত সীমিত।সে যুগে উচ্চবর্ণের নারীদের শিক্ষা গ্রহণে নিষেধাজ্ঞা থাকলেও নিম্নবর্গের নারীরা শিক্ষার বাইরে ছিলেন না। তবে মুঘল হারেমে বহু মহীয়সী মহিলাদের রচিত গ্রন্থ থেকে আমরা মুঘল সম্রাটদের সম্পর্কে জানতে পারি।

আধুনিক যুগে ভারতবর্ষে উপনিবেশিক কাল পড়বে প্রথম নারী শিক্ষা বিস্তারের জন্য একটি পৃথক মহিলা বিদ্যালয় প্রস্তাব এসেছিল উত্তরপাড়া জমিদার শ্রীযুক্ত জয় কৃষ্ণ মুখার্জির কাছ থেকে।তবে উপনিবেশিক ভারতবর্ষে স্ত্রী শিক্ষার অগ্রগতির প্রথম কান্ডারী ছিলেন জন এলিয়ট ড্রিঙ্কওয়াটার বেথুন। ১৮৪৯ সালে কলকাতা সুকিয়া স্ট্রিট দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের বাড়ির বৈঠকখানায় ২১ জন বালিকাকে নিয়ে শুরু করেন ক্যালকাটা ফিমেল স্কুল।পরবর্তীকালে লর্ড ডালহৌসি সহযোগিতায় বেতন প্রতিষ্ঠা করেন হিন্দু ফিমেল স্কুল যা পরবর্তীকালে লোকমুখে পরিচিত লাভ করে বেথুন স্কুল নামে।মাতৃভাষার মাধ্যমে প্রথাগত শিক্ষা দানের সঙ্গে সঙ্গেই মেয়েদেরকে সূচিশিল্প অঙ্কন বিদ্যায় পারদর্শী করে তোলা ছিল মূল উদ্দেশ্য। ১৮৭৮ খ্রিস্টাব্দে স্কুল একটি উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয় রূপান্তরিত হয়, ১৮৮১ খ্রিস্টাব্দে বিদ্যালয়টি কলেজিয়েট স্কুলে রূপান্তরিত হয়।

নারী শিক্ষা বিষয়ে বিদ্যাসাগর বেথুন সাহেবের আন্তরিক প্রচেষ্টা সত্ত্বেও বাংলায় নারী শিক্ষার অগ্রগতি ছিল অত্যন্ত শ্লথ। বিংশ শতকের সূচনায় দেখা যায় সারাদেশে মাত্র ৪.৫ লক্ষ মেয়ে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তির সুযোগ পেয়েছিলেন। লর্ড কার্জনের শিক্ষা সংকোচনে আগ্রহী ছিলেন। ১৯০৪ খ্রিস্টাব্দে দেখা যায় স্কুল পর্যায়ে পুরুষ ও মহিলার আনুপাতিক হার ছিল ১০:১। জনগণ সংস্কারপন্থী হওয়ার ফলে এবং বাল্য বিবাহ প্রচলন থাকায় বর্ণহিন্দুদের মধ্যে শিক্ষার গতি হ্রাস পেয়েছিল। মুসলিম সমাজের পর্দাপ্রথা মহিলাদের শিক্ষা থেকে দূরে রেখেছিল।দেখা যাচ্ছে নারীশিক্ষার অনগ্রসরতার পেছনে অন্যতম সমস্যা ছিল সামাজিক বাধা।

১৯১৯ লর্ড চেমসফোর্ড এর সময় সরকার একটি বোর্ড গঠনের মাধ্যমে উচ্চশিক্ষায় ধীরে ধীরে মেয়েদের সংযুক্ত করতে থাকে।বেনারসের শিব প্রসাদ গুপ্ত এবং কলকাতায় বিনয় সরকারের অন্যায় কার নেতৃত্বে পুনাতে প্রথম বেসরকারি উদ্যোগে মহিলা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯১৬ খ্রিস্টাব্দে। গুজরাট ও মহারাষ্ট্রের গড়ে ওঠে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় ১৯৩১ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ।আরজি ভান্ডারকার আরপি পরাঞ্জপে ও ভিঠলদাস ঠাকরের সহযোগিতায় পশ্চিম ভারতে নারী শিক্ষার অগ্রগতি ঘটে। সরকারি আইন এর ফলে শহরাঞ্চলে উচ্চশ্রেণীর হিন্দুদের মধ্যে বাল্যবিবাহের পরিমাণ কমে আসায় বিধবার পুনর্বিবাহ বিস্তার লাভ করে রাজনৈতিক ও সামাজিক জাগরণ শুরু হয় এবং মেয়েদের শিক্ষাঙ্গনে প্রবেশের সুযোগ ঘটে। মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সিতে সেন্ট তেরেসা কলেজ, ত্রিবানদমে মহারাজা কলেজ , পাঞ্জাবে লাহোর কলেজ উত্তরপ্রদেশের ইসাবেলা থোকার্ন কলেজ বেনারস আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয় প্রভৃতি নারী শিক্ষার অগ্রগতিতে বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করেছিল।১৯২৭ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ ভারতবর্ষে ৭৩৮ জন মহিলা শিক্ষার্থী ছিলেন উচ্চশিক্ষায় রত ছিলেন। বোম্বে প্রেসিডেন্সিতে নারী শিক্ষার হার ছিল সবচেয়ে বেশি।দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় উচ্চ শিক্ষার প্রসার ঘটেছিল কারণ সরকারি অফিসের মহিলাদের কাজের সুযোগ বাণিজ্যিক সংস্থা মহিলাদের কর্মী হিসেবে নয় এবং বিভিন্ন স্কুলের শিক্ষিকা নিয়োগ ঘটেছিল। যুদ্ধকালীন পরিস্থিতি মোকাবেলা করার জন্যদ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পাওয়ায় মধ্যবিত্তদের উপর যে আর্থিক চাপ সৃষ্টি হয় সেজন্য ঘরের মেয়েরাও যুক্ত হয় বাইরের কাজে। দেখা যাচ্ছে ভারতীয় সমাজ ক্রমশ বৃত্তিজীবী মেয়েদের মেনে নিতে থাকে। মহিলাদের স্বনির্ভর হওয়ার প্রবণতা ক্রমশ শুরু হয়।

ভারতীয় শিক্ষিত সমাজে ঔপনিবেশিক কালে নারী শিক্ষার ওপর গুরুত্ব দিয়েছিল। মূলত সমাজ সংস্কার ও অশিক্ষিত ভারতীয় নারীরা করতে চেয়েছিল এক 'নতুন নারী' দল।ভারতীয়

পুরুষ সংস্কারক রা নারী শিক্ষার অগ্রগতিতে বিশেষ ভূমিকা অবতীর্ণ হয়েছিলেন।এ প্রসঙ্গে বাংলা রাধাকান্ত দেব ও কেশব চন্দ্র সেন, পশ্চিম ভারতের মহাদেব গোবিন্দ রানাডে, উত্তর ভারতের স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী, মাদ্রাজে এনি বেশান্ত নারী শিক্ষা নিয়ে শুধু চিন্তা করেননি তারা সেই ভাবনার প্রতিফলন ঘটিয়ে ছিলেন নানা প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে দিয়ে।নারী শিক্ষার অগ্রগতিতে যেসব শিক্ষিত ভারতীয় নারীরা এগিয়ে এসেছিলেন তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন পশ্চিম ভারতের পন্ডিতা রামাবাই দক্ষিণ ভারতের ভগিনী সুব্বালক্ষী এবং পূর্ব ভারতের বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন। তবে নারী শিক্ষারফোন করলেও নারীদের সামাজিক অবস্থানের সেরকম উল্লেখযোগ্য উন্নতি সেসময় ঘটেনি।

উনবিংশ শতকের মধ্যভাগ থেকে নারীর অবস্থান নিয়ে সাম্প্রতিক গবেষকরা নতুন নতুন তথ্য আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন। Geraldine Forbes তার গবেষণায় দেখিয়েছেন নারীশিক্ষা আন্দোলনের উদ্দেশ্যের মধ্যে কখনোই নারী মুক্তির বিষয়টি বিশেষ গুরুত্ব পায়নি।
উপনিবেশিক শাসক দলের উদ্দেশ্য ছিলো পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত নারীরা সন্তানের জন্ম দেবে তা হবে ওই পরিবেশের শাসকের অনুগত। শিক্ষিত ভারতীয় পুরুষের চেয়ে ছিল যে জ্ঞানপ্রাপ্ত নারী যেন তাদের আদর্শ সঙ্গিনী হয়ে ওঠে।এখানে ভিক্টোরিয়ান যুগের সহধর্মিণী নীতিগুলো অর্থাৎ কিনা সাধ্বী স্ত্রী,সুমাতা ও আদর্শ গৃহিণী তৈরি করার, প্রয়াস ভারতীয় সমাজের পরিলক্ষিত হয়। এখানে নতুন ভারতীয় নারীর যে কল্পনা করা হয় সেখানে ভারতীয় নারী ধর্মীয় চেতনা সম্পর্কে প্রচার মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অবস্থান এবং লিঙ্গ বৈশিষ্ট্যে মাতৃত্বের প্রতীক গড়ে তোলার অপরিসীম প্রচেষ্টা দেখা যায়।মেয়েদের পাঠক্রম নিয়েও বিতর্ক ধরা পড়ে সমাজ সংস্কারকের মধ্যে।ভারতীয় নারী শিক্ষার কর্মসূচি গুলোই এমনভাবে রচিত হয়েছিল যেগুলি শিক্ষা লাভ করে জানো একটি মেয়ে বিশেষ নারীদের প্রতিমূর্তি হয়ে উঠতে পারে।মেয়েদের জন্য সে যুগে যে সব পত্রিকা প্রকাশিত হতো তার নামকরণ গুলো লক্ষ্য করলে এক বিশেষ শ্রেণী চেতনার পরিচয় পাওয়া যাবে যেমন বামাবোধিনী পত্রিকা (১৮৬৩)অবলা বান্ধব (১৮৫৯) মহিলা (১৮৯৭)দাসী (১৮৯৭) অন্তঃপুর (১৮৯৮) ইত্যাদি।সুতরাং শুরু থেকেই নারী সংক্রান্ত সংস্কার বিষয়টিতে নারীর নিজস্ব চেতনাকে উপেক্ষা করার প্রবণতা লক্ষ্য করা গিয়েছিল।সংস্কৃতায়ন এর দ্বারা প্রভাবিত হয়ে নিম্নবর্ণের মানুষের মধ্যেও নারী সুরক্ষা কে মর্যাদা সুযোগ হিসেবে মান্যতা দেয়া বাধ্য হয়।যার ফলে নিম্ন বর্ণের মধ্যে রক্ষণশীলতা বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং নিম্ন বর্ণের নারীরাও শিক্ষা লাভের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হতে থাকেন।

পরিশেষে বলা যায়,উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ থেকেই ভারতীয় নারীর সামাজিক অবস্থা জটিল আকার ধারণ করেছিল।ইউরোপীয় দৃষ্টিতে ভারতীয় নারীদের ধারণাকে দেখানো হয়েছে দুর্বল অযৌক্তিকতা ভরা এবং ঠুনকো সত্তা হিসেবে। এবং সমাজের উচ্চবর্ণের হিন্দু নারীর কুসংস্কারগুলো দূর করায় তাদের মূল উদ্দেশ্য হয়ে দাঁড়ায়। তবে ঔপনিবেশিক সরকারের ভারতীয় নারীর প্রতি আচরণ ছিল দ্বিচারিতা পূর্ণ।কারণ একদিকে যেরকম কুসংস্কার দূরীকরণে কথা বলা হচ্ছে অন্যদিকে নারীকে শিক্ষিত করে তোলার বিষয়ে ব্রিটিশ শাসকরা দীর্ঘদিন কোনো সরকারি উদ্যোগ গ্রহণ করেনি। মহিলাদের অবস্থান পরিবর্তন বিষয়ে বিশেষ আগ্রহ ও উপনিবেশী সরকার দেখায়নি।ভারতীয় সমাজ সংস্কারক ও জাতীয়তাবাদী নেতৃত্ব প্রয়োজনে বা সুবিধা অনুসারে আন্দোলনে নারী প্রসঙ্গটি নিয়ে বিভিন্ন পরীক্ষা নিরীক্ষা চালিয়েছেন। এরই ফলশ্রুতিতে ভারতীয় নারীর নিজস্ব সত্তার বিকাশ প্রায় অসম্ভব হয়ে ওঠে।